যুগান্তর

তারিখ ... 13 MAR 2007 ... ২৮
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

স্কুল শিক্ষকের কাছে কোচিং না করায় পরীক্ষা দেয়া হল না ৩০ শিক্ষার্থীর

মুশতাক আহমদ

স্কুলের শিক্ষকের কাছে কোচিং না করার অপরাধে (!) ৩০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে গেল মূল্যবান একটি বছর। এসব ছাত্রছাত্রীর সবাই ছিল ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দায়ের করায় কিছু অভিভাবকের কাছ থেকে মুচলেকা নেয়া হয়। আর অভিযোগের নেতৃত্বদানকারী অভিভাবকের মেয়েকে ২০০৭ সালের পরীক্ষায়ও অংশ নিতে দেয়া হয়নি। এই অমানবিক অভিযোগটি উঠেছে রাজধানীর মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগের তদন্ত করছে।

এদিকে চলতি ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায়ও ৬ ছাত্রছাত্রী একই কারণে পরীক্ষা দিতে পারেনি বলে জানা গেছে। এরা এক বিষয়ে ফেল করার কারণে ফরমফিলাপে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। পরে প্রভাবশালী কয়েকজন শিক্ষক জনপ্রতি ৮ হাজার টাকা করে দাবি করেন। জানা গেছে, চাহিদামতো টাকা দেয়ার পরও ৬ জনের প্রবেশপত্র আসেনি। ভুক্তভোগীদের দাবি, টাকা নিয়েও ফরমফিলাপ করা হয়নি। তারা স্কুলের শিক্ষকদের সম্পদের হিসাব নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

ভুক্তভোগী ছাত্রী ফারজানা বিনতে সাঈদের বাবা মোঃ সাঈদুল ইসলাম জানান, তার মেয়েকে স্কুলের গণিত শিক্ষক আবুল কাসেমের কাছে কোচিং করাতেন। টেস্ট পরীক্ষার কয়েক মাস আগে মেয়েকে তিনি স্কুলের বাইরের অন্য এক শিক্ষকের কাছে পড়তে দেন। তখন স্কুলের ওই শিক্ষক না পড়লে মেয়ে অংকে ফেল করবে বলে তাকে জানিয়ে দেন এবং যথারীতি নির্বাচনী পরীক্ষায় তার মেয়ে অংকে অকৃতকার্য হয়। সাঈদুল ইসলাম জানান, এভাবে আরও ৩০ ছাত্রছাত্রীকে এক বিষয়ে ফেল করিয়ে দেয়া হয়। যাদের কেউ গণিত, কেউ বিজ্ঞান, ইংরেজি, বাংলা বা একাউন্টিং বিষয়ের শিক্ষকের কাছে কোচিং করতো এবং পরবর্তী সময়ে তাদের কাছে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৩০ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে ৩ জন যৌথভাবে অভিযোগ করেন। এছাড়া আরও ৮ অভিভাবক বিভিন্ন স্থানে এ নিয়ে ধরনা দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়া আবেদনে বলা হয়, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, স্কুল শাখার প্রধান এবং গণিত শিক্ষক আবুল কাসেম শিক্ষার্থীপ্রতি ৩০ হাজার টাকা করে দিলে পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়ার কথা জানান। তারা আরও জানান, শিক্ষা সচিবের কাছে ওই অভিযোগ দায়েরের পর একজন উপ-সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিষয়টি দেখভালের জন্য। কিন্তু ওই উপ-সচিবও শিক্ষার্থীপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে খরচ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অভিভাবকরা জানান, টাকা না দেয়া কিংবা প্রয়োজন মেটাতে না পারায় শেষ পর্যন্ত কাউকেই পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয়নি।

অভিভাবক সাঈদুল ইসলাম জানান, এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হলে পরবর্তী সময়ে ২২

কোচিং : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

কোচিং : না করায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রীকে পুনঃভর্তি করিয়ে নেয়া হয়। এ সময় অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা আদায় করা হয়। কিন্তু শাস্তি দেয়া হচ্ছে তার মেয়েসহ নেতৃত্বদানকারী অন্য ৮ অভিভাবকের সন্তানদের। সাঈদুল ইসলাম বলেন, নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে তার মেয়েকে পুনঃভর্তি করা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, রেজিস্ট্রেশন কার্ডও আটকে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ কারণে অন্য স্কুল থেকেও মেয়েকে পরীক্ষা দেয়াতে পারছেন না। আর স্কুল থেকে ছাড়পত্র না দেয়ায় অন্য স্কুলে নবম শ্রেণীতেও ভর্তি করানো যাচ্ছে না। ফলে দশম শ্রেণীতেই শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তার মেয়ের শিক্ষাজীবন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক জানান, তাদের কাছ থেকে টাকা দাবি এবং কোচিং করার দায়ে ছাত্রীকে ফেল করানোর অভিযোগ অসত্য বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ মুচলেকা নেয়। সন্তানের শিক্ষাজীবনের কথা ভেবে এক বছর লস দিয়ে হলেও মুচলেকায় সই করে সন্তানকে পুনঃভর্তি করান তারা। একজন অভিভাবক বলেন, পুনঃভর্তি করিয়েও তাদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেয়া হয়েছে। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে।

অকৃতকার্য অন্য ছাত্রছাত্রীকে পুনঃভর্তি করিয়ে পরীক্ষার অনুমতি এবং ২০০৭ সালের চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পেরে ফারজানা বিনতে সাঈদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি দেয়া ওই অভিযোগপত্রে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি তৎকালীন স্থানীয় সংসদ সদস্য মির্জা আব্বাসের ভাই মির্জা খোকনের জনপ্রতি ১ লাখ টাকা দাবি, মির্জা আব্বাসের শরণাপন্ন হলে ১ লাখ টাকা থেকে কমিয়ে ৩০ হাজার টাকা করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন এবং জনৈক উপ-সচিবের ১০ হাজার টাকা করে খরচের প্রস্তাব ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০০৬ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকার পেলে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে মূল্যবান এক বছর ঝরে যেত না। পত্রে ফারজানা ওই উপ-সচিবের বিচারের পাশাপাশি তার শিক্ষাজীবন রক্ষার আবেদন করে। জানা যায়, প্রধান উপদেষ্টার কাছে অভিযোগ দায়েরের কয়েক দিন পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ছাত্রী ফারজানা সাঈদের কাছে অতিরিক্ত সচিব আবদুল মতিন চৌধুরীর পাঠানো পত্রে পরের দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের ১৭০৯ নম্বর কক্ষে হাজির হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হয়।

গণিতের শিক্ষক আবুল কাসেমের সঙ্গে কয়েক দিন ধরে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে কলেজের অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা জানান, ৪ মার্চ তিনি মন্ত্রণালয়ে তদন্ত কমিটির সামনে কথা বলে এসেছেন। গত মাসে অসুস্থ থাকায় তিনি তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হতে পারেননি। মন্ত্রণালয়ে আলোচনায় ফারজানাকে ২০০৮ সালের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়ার কথা এসেছে। ৩০ শিক্ষার্থী নয়, ২৮ শিক্ষার্থী এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। আর ফেল করিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না। এ ব্যাপারে তার কাছে কোন অভিযোগও আসেনি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা একথা বলতে পারবেন বলে অধ্যক্ষ জানান। তিনি বলেন, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ছাত্রছাত্রীকে ফেল করিয়ে দেন না। শিশুদের সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতা নেই। আর মির্জা আব্বাসের ভাই মির্জা খোকন অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে টাকা দাবি করেননি বলে তিনি দাবি করেন। অধ্যক্ষ বলেন, বরং মির্জা খোকনের নির্দেশে পরবর্তী সময়ে ফেল করাদের সাপ্লিমেন্টারি নেয়া হয়েছিল। তাতেও ওরা ফেল করে। আর ২৮ জনের মধ্যে পরবর্তী সময়ে যারা যোগাযোগ করেছে, তারা ২০০৭ সালের চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে। ফারজানাসহ বাকি ৬ জন যোগাযোগ করেনি। রেজিস্ট্রেশন কার্ড আটকে রাখা এবং প্রশংসাপত্র না দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, তারা বরং অভিভাবকদের উৎসাহিত করেন শিক্ষার্থীকে অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়ানো হোক। তার কাছে রেজিস্ট্রেশন কার্ড বা প্রশংসাপত্র চাওয়া হয়নি বলে তিনি দাবি করেন।

এ ব্যাপারে তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব আবদুল মতিন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি। অফিস সহকারী মুর্শিদা জানান, স্যার সচিব মহোদয়ের রুমে মিটিংয়ে [illegible]